নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৯, পৃ : ৩৭-৪৮
© ২০০৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সামাজিক পুনরুৎপাদনে জ্ঞাতি সম্পর্ক ঃ বাংলাদেশের একটি ছোট শহরের প্রেক্ষাপটে কিছু তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

মো: আদিল হাসান চৌধুরী*

ভূমিকা

জ্ঞাতি সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্কের একটি মৌলিক সম্পর্ক বিন্যাস। বাংলাদেশের মত প্রায় গ্রাম প্রধান সমাজে এটি সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তিসমুহের অন্যতমও বটে। জৈবিক পুনরুৎপাদনের জন্য জ্ঞাতি সম্পর্কের উপস্থিতি যেমন অবধারিত, তেমনি ব্যক্তির সামাজের সদস্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সর্বদাই জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। জৈবিক পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্পর্ক নির্ধারিত হলেও সামাজিক পুনরুৎপাদনে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা স্থির থাকেনা বরং একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে। এটাকে রক্ত সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক বা পাতানো সম্পর্কের কোন একটির ভিত্তিতে নির্ধারন করা যায়না। বিশেষত সমাজ যখন কৃষি অর্থনীতি, ভূমি ভিত্তিক সম্পর্ক বিন্যাসের বাইরে নগরের বহুবিধ কর্মকাণ্ড ভিত্তিক সম্পর্ক বিন্যাসের দিকে পরিবর্তিত তখন একটি ছোট শহরে[১] এর স্বরূপ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

রক্ত, বিয়ে ও পাতানোর ভিত্তিতে তৈরী হয় জ্ঞাতি

জ্ঞাতি সম্পর্ক কোন 'প্রাকৃতিক' বা প্রদেয় (given) সম্পর্ক নয়, মানুষ তার প্রয়োজনে এই সামাজিক সম্পর্ক জাল তৈরি করে থাকে। এই সম্পর্ক সামাজিক, তাই এর অর্থ এবং ভূমিকাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তীত হয়ে থাকে (standing, 1991; Yanagisako, 1987)। তবে পরিবর্তিত সমাজ কাঠামোতে অর্থাৎ শহুরে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্রিয়াশীলতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রক্ত সম্পর্ক ভিত্তিক আত্মীয়তার গুরুত্ব অনেক বেশী, তবে বৈবাহিক সম্পর্ক ও পাতানো সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া আত্মীয়দের গুরুত্বও অগ্রাহ্য করা যায়

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

না। পরিবার পরিসরে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা সরাসরি যুক্ত। গৃহস্থালীর কাজে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের পাশাপাশি পাতানো আত্মীয়দের[২] ভূমিকা স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে, যেখানে কিনা বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়রা মতাদর্শিকভাবে না হলেও প্রাত্যাহিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন।

জ্ঞাতিসম্পর্কের নৈতিকতা অনুধাবনের মধ্য দিয়ে পাতানো আত্মীয়রাও রক্ত ও বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত আত্মীয়দের মত দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকেন। গৃহস্থালীর কাজ, সন্তান লালন-পালন, অভিগমনে সহায়তা, কাজ ও সম্পদ অর্জনে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দূরের আত্মীয় বা পাতানো আত্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন (Standing, 1991)।

জ্ঞাতিদের মাঝে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় নারী

জৈবিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় পাতানো আত্মীয়, যেমন প্রতিবেশী ও কাজের লোকদের (যারা এই সম্পর্ক ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পরকে জ্ঞাতি বাচ্যে সম্বোধন করে থাকে) ভূমিকা ব্যাপক। নারীর প্রসব পূর্বকালীন সময় থেকে শুরু করে প্রসব পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশীরা, বিশেষত নারী প্রতিবেশী ও গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত কাজের লোকদের ভূমিকা খুব সহজেই চোখে পড়বার মত এবং এর গুরুত্বও অনস্বীকার্য। মনে রাখা প্রয়োজন কাজের লোকেরা কোন না কোন জ্ঞাতি বাচ্যে সম্পর্কিত, যা নির্দ্দিষ্ট সাংস্কৃতিক অর্থ বহন করে বলে তারা দায়িত্ব বোধ উপলব্ধি করেন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর গর্ভাবস্থায় ও গর্ভপরবর্তীতে গৃহস্থালীর কাজ ও সন্তান লালন পালনে মাতৃসূত্রীতা (Matrifocality) দৃশ্যমান হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান প্রসবের জন্য নারীদেরকে তাদের মায়ের বাড়ী যেতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নতুন জন্ম নেয়া বাচ্চাটিকে এবং তার প্রসূতি মাকে দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন ঐ প্রসূতির মায়ের মা তথা সদ্যোজাত বাচ্চার নানী। যদি কোন নারী প্রসবের জন্য বাবার বাড়ী না যেয়ে থাকেন সেখানে অনেক কিছু, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার[৩] বিষয়কে মাথায় রেখেই এমনটি ঘটে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ঐ নারীর মা বা ছোট বোন এসে গুরুত্বপুর্ন সেবার বিষয়টি নিশ্চিত করে। গর্ভবতী অবস্থায় সেবা যত্নের ক্ষেত্রে ‘জা’দের (স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী) ভূমিকা সন্তোষজনক। ননদ (স্বামীর বোন) ও শাশুড়ীর (স্বামীর মা) নিকট থেকেও সেবা পাওয়া যায় তবে এতে অনেক নারীই

তৃপ্ত হন না। শ্বশুর বাড়ীতে নারীরা বিশেষ করে চাচা শ্বাশুড়ী (স্বামীর চাচার স্ত্রী) , ফুফু শ্বাশুড়ী (স্বামীর ফুফু), কাজের লোক ও প্রতিবেশীদের সেবা পেয়ে থাকেন। যে গবেষণার ভিত্তিতে এ লেখা সেটিতে একজন উত্তরদাত্রী যেমন বলেছেন "আমার পেটে যখন বাচ্চা ছিল, তখন পাশের বাড়ীতেই থাকে আমার ফুফু শ্বাশুড়ী, তিনিই সকাল বিকালে আমার খবর নিতেন ও আমার সেবা যত্ন করতেন। বাড়ী থেকে পুষ্টিকর খাবার তৈরী করে এনে আমাকে দিতেন"।

জ্ঞাতিদের মাঝে সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ, আতিথেয়তা প্রভৃতি কাজগুলো করে থাকে মূলতঃ নারীরা। বিয়ের পরে নারীরা যেমন তার শ্বশুরকূলের আত্মীয়দের খোঁজ খবর রাখে তেমনই তার শ্বশুর বাড়ীর মানুষের সাথে তার বাবার বাড়ীর জ্ঞাতিদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নারীরাই সেতু বন্ধন হিসাবে কাজ করে। জ্ঞাতি সম্পর্ক গঠনে তাই নারী-পুরুষের যৌথ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তবে লক্ষ্যণীয়ভাবে দেখা যায় যে, জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কাজ এবং ভূমিকায় ভিন্নতা রয়েছে। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে নারীরা তাদের ভাই বা নিয়োগকৃত অন্য কোন পুরুষ ব্যক্তির উপর নির্ভর করতে পারে। অন্যদিকে, ঘরের কাজ এবং সন্তান লালন-পালনসহ সার্বিক সামাজিক পুনরুৎপাদনমূলক কাজে নারী-জ্ঞাতিদের ভূমিকাই মুখ্য।

জ্ঞাতিসম্পর্ককে প্রাকৃতিক বিষয় হিসাবে উল্লেখ করে এর ভিতর দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয় যে আমাদের সমাজে কিভাবে পরিবারের ভিতর দিয়ে লিঙ্গীয় অসমতা ও শ্রেণী অসমতার ধরণ তৈরী করা হয়, যেখানে পারিবারিক কাজ হিসাবে সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব নারীর উপর বর্তায়। বংশ, মিত্রতা ও বিয়ের লেনদেন বিশ্লেষণ করতে গেলে বিশ্লেষণী হাতিয়ার (analytical tool) হিসাবে লিঙ্গ অধ্যায়ন পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। বিবেচ্য গবেষণার অন্য একজন উত্তরদাত্রীর বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন: "মেয়েদের আসল ঠিকানা শ্বশুর বাড়ীতে, বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ীর লোককেই আমরা আপন করে নেই।" বিশ্লেষণের দিক দিয়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক ও লিঙ্গ খুবই কাছাকাছি ও আন্তসম্পর্কিত। জ্ঞাতিসম্পর্ক ও লিঙ্গকে এক সাথে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন বলেই নারীবাদী লেখকরা দাবী করেন (Yanagisako, 1987)।

জ্ঞাতিসম্পর্ক একাধারে বৈষয়িক ও মতাদর্শিক

সাধারণত জ্ঞাতিরা বলেন যে, নিকট জ্ঞাতিদের মাঝে সম্পর্ক থাকবে খুব নিবিড়, তারা একে অপরকে সহযোগিতা করবে, ঝগড়া এড়িয়ে চলবে প্রভৃতি। কিন্তু এটা

আদর্শ একটা ধারণা এবং জ্ঞাতিদের মাঝে এর উল্টো আচরণও দেখতে পাওয়া যায় (Keesing, 1981:122; Standing, 1990:4)। জ্ঞাতিদের মধ্যে যারা যত নিকট আত্মীয় তাদের মাঝে তত বেশী মিথক্রিয়া হয়। আর দৈনন্দিন জীবনে গৃহস্থলীর কাজ, সম্পদের বন্টন ও পুনর্বন্টন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানিকতাকে কেন্দ্র করে জ্ঞাতিদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্বও তৈরি হয়। তাই জ্ঞাতিসম্পর্ক মানে যে কেবল মাত্র 'মধুর' সম্পর্ক এমন নয় বরং নানা ধরনের টানাপোড়নের ভিতর দিয়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক 'তিক্ততার' সম্পর্কেও পরিণত হতে পারে (Standing, 1990; Islam, 1998)।

গ্রাম সমাজে স্থানীয়ভাবে বংশীয় দল বসবাস করে বলে **অর্থনৈতিক উৎপাদন** কর্মকাণ্ডে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায় (আরেফিন, ১৯৯৪), তেমনি **রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে** বংশের লোকেরা পরস্পরকে মদদ দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে রাজনৈতিক মতাদর্শে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞাতিত্বের কারণে একত্র হয়ে যাওয়া নিয়তই দেখা যায়, যে কারণে শ্রেণী বৈষম্য এবং শ্রেণী সংগ্রাম না ঘটে জ্ঞাতিদের মধ্যে স্বার্থ দলের উন্মেষ ঘটে (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৭)। অথচ নিবিড় অধ্যয়নের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট যে, বংশের মধ্যে পরিবারসমূহ ধনী ও গরীব শ্রেণী হিসাবে থাকতে পারে এবং পারিবারিক দারিদ্র্য আত্মীয়তার সম্পর্কে ভাঙন ধরাতে পারে বলে কোন কোন গবেষক মনে করেন (আরেফিন, ১৯৯৪)। যদি কোন গোষ্ঠীর বেশীর ভাগ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয় তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। কিন্তু গবেষণা পর্যবেক্ষণে (আরেফিন, ১৯৯৪) দেখা যায় সাম্প্রতিককালে বাজার অর্থনীতির বিস্তারের ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে খুব দ্রুত।

জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অধ্যয়ন গুরুত্বের দাবিদার। নারী-পুরুষের মধ্যকার যে সম্পর্ক তা অসম সম্পর্ক। পুরুষ ও নারীর অধিকার, উত্তরাধিকার বা সম্পর্কের ধরন ও বিস্তার সমাজে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নির্দেশ করে। যার কারণে বাংলাদেশের সমাজে প্রধানত নারীরা কন্যা হিসাবে বিয়ের আগ পর্যন্ত ই বাবার (পিতৃকূলে) বাড়ীতে অধিকার পান। কিন্তু বিয়ে পরবর্তীতে সেই অধিকার অসম্পূর্ণ বা আংশিক হয়ে যায় বিধায় নিজ 'রক্তের' সম্পর্ককেও 'দূরের' মনে করতে বাধ্য হন। অপরদিকে পুরুষ তার নিজ বাড়ীতে অবস্থান করে, ঘরে বউ তুলে আনার মধ্য দিয়ে নিজের রক্তের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে এবং বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞাতিদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। মতাদর্শিকভাবে পুরুষের বংশ স্পষ্ট, যদিও বাস্তবে তার পরিবর্তন হয়। এ কারণেই বিয়ের মাধ্যমে মিত্রতা স্থাপনের

বিষয়টি (লেভিষ্ট্রস, ১৯৭৩) নারীবাদীরা অস্বীকার না করলেও তারা তাদের কাজের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট করেন যে নারী পুরুষের সম্পর্ক কেবলমাত্র অসমই নয় বরং নারী বিভিন্নভাবে পুরুষের অধঃস্তন হয়ে যায়। তাই জ্ঞাতি সম্পর্ক অবশ্যই একটি লিঙ্গীয় রাজনীতির বিষয়।

জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন প্রেক্ষিত নির্ভর

'একক' পরিবার ও 'যৌথ' পরিবারের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ভিন্ন হয়; উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনকে কেন্দ্র করে যৌথ পরিবারে জ্ঞাতিদের মধ্যে দূরত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতা দেখা যেতে পারে। কাঠামোয় যৌথ হলেও রক্তের নৈকট্যের/ ঘনত্বের মতাদর্শ তাই স্থির (Fixed) ধারণা নয়। তেমনি একক পরিবারে বিয়ের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভোগ বন্টনের ক্ষেত্রে অনেক বেশী সমতার মনে হলেও নারী-পুরুষে অসম বিন্যাস আছে। তাছাড়া বিশেষ সময়ে পরিবারে অন্যান্য জ্ঞাতি বা পাতানো আত্মীয়ের জোরালো ভূমিকা এটাই প্রমাণ করে যে (ক) চিরন্তন বা চিরস্থায়ীভাবে কোন পরিবার 'একক' পরিবার হিসেবে থাকতে পারে না; (খ) পরিবারের পরিচালনা, পুনরুৎপাদন ও অগ্রসরতায় 'আত্মীয়তা' সম্পৃক্ত থাকে, যা 'একক' পরিবারের স্বাতন্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। অর্থাৎ, গৃহস্থালী হিসাবে 'একক' হলেও জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্রিয়াশীলতা এই 'একক' পরিবারের সুনির্দিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। জ্ঞাতিত্বের বন্ধন ও ক্রিয়াশীলতা যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে, একক পরিবারে জ্ঞাতিত্বের মাত্রা নির্ধারণ করে মূলত স্বামী-স্ত্রী।

এছাড়া জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নে সামাজিক অবস্থানকে বিবেচনায় আনতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে অসম অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের মাঝে জ্ঞাতিসম্পর্কের অর্থও ভিন্ন। একজন ধনী আত্মীয়কে বস্তুগত ও আবেগের জায়গা হতে একজন দরিদ্র[৪] আত্মীয় যতটা কাছের মনে করেন, ধনী আত্মীয়ের কাছে সামাজিকভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকা আত্মীয়কে তেমন কাছের নাও মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য একজন উত্তরদাতা বলেন "দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে নিকটও পর হয়ে যায়। আমার ভাস্তির বিয়েতে আমারই শ্যালক এ বাড়ীতে কদর পায়। সমানে সমান না হলে আত্মীয় আর আত্মীয় থাকেনা"। জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে এই শ্রেণীগত তারতম্য বোধ শ্রেণী ভিত্তিক সমাজের অসম কাঠামোকেই নির্দেশ করে। এটি ক্ষমতা সম্পর্কের প্রতিফলনও বটে। এই ক্ষমতার বন্টন হয়ে থাকে ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, শ্রেণী অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। জ্ঞাতিসম্পর্ক একাধারে কারো কারো ক্ষমতার ভিত্তি হয়, তেমনি ক্ষমতাচ্যুত বা ক্ষমতাহীন করে দেবার মাধ্যমও হয়ে দাড়ায়। তাই জ্ঞাতি সম্পর্কের মাত্রা নির্ভর করবে পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটের উপর।

জ্ঞাতিসম্পর্ককে দেখতে হবে একটি প্রক্রিয়ার ভিতরদিয়ে

ব্যক্তির জন্ম হয় জৈবিক পুনরুৎপাদনের ভিতর দিয়ে। আর ব্যক্তির জৈবিক পুনরুৎপাদন প্রথমত স্বামী-স্ত্রীর মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যম ঘটলেও ব্যবহারিকভাবে বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে পাতানো সম্পর্কের (প্রতিবেশী, কাজের মানুষ) মানুষ জনেরও। তাই জ্ঞাতি সম্পর্ক প্রাকৃতিক বিষয়ই নয় বরং এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর থেকে শিশুর সামাজিক মানুষে পরিনত হওয়া পর্যন্ত শিশুর সামাজিকীকরনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে শিশুর মা, এর পর যদিও বড় হতে থাকে পিতৃ পরিচয়ে। সুতরাং জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে মতাদর্শ ও ব্যবহারিক সম্পর্ক এই জায়গাটাতেই একটু ভিন্ন অবস্থানে থাকে।

জৈবিক পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি ঘটলেও তার সামাজিক পুনরুৎপাদন ঘটে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। জীবন এর বিভিন্ন পর্যায় বিশেষ করে জীবন চক্রের তিনটি পর্যায় যেমন জন্ম, মৃত্যু ও বিয়েকে যদি আমাদের পর্যবেক্ষনে আনি তাহলে দেখব প্রতিটি ক্ষেত্রেই জ্ঞাতিসম্পর্কের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির জন্ম থেকে শুরু করে বিকাশ এবং মৃত্যুতে অবসান হওয়া পর্যন্ত এই সম্পর্ক সরাসরি ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত, এমনকি মৃত্যুর পরও বংশ নির্মানের কারনে উত্তরাধিকার প্রবাহের এবং বিয়ের বৈধ চুক্তির ফলে এ সম্পর্ক পরবর্তী ও সংশ্লিষ্ট আত্মীয়দের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।

ব্যক্তি জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ (যেমন, জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু) অতিক্রম করে সমাজের সদস্য হিসাবে আর তার জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়েই থাকে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা। সন্তানকে লালন পালন করে থাকে তাঁর বাবা-মা, কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক অবকাঠামোগত কারণে অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলো, শুধুমাত্র শিশু নয় বরং মানুষের মৌলিক চাহিদা পুরণ করে তার উপার্জনক্ষম বড় ভাই অথবা বিবাহিত বোন। এখানে মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব যেমন জন্মদাতাদের থেকে সরে সহকারী দলের উপর আসাতে জ্ঞাতির মতাদর্শিক দায়িত্ববোধ বদলে যায়। তেমনি বিয়ের পর বোনের বা কন্যার ভূমিকাও প্রথাগত বিশ্বাস বা মতাদর্শিক অর্থ থেকে দূরে সরে যায়। নৃবিজ্ঞানের কাজে এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। কেননা জ্ঞাতিসম্পর্ক এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি কাঠামো নয় বরং একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া (Process) হিসেবে প্রতিভাত হয়। এ কারণেই একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়ন করতে হবে। ব্যক্তিক ক্ষেত্র হিসাবে জ্ঞাতিসম্পর্ক ও লিঙ্গকে না বুঝে বরং সামাজিক সমগ্রতার ভিতর দিয়ে একে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বাংলাদেশের জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়ন

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নৃবৈজ্ঞানিক রচনাবলীতে জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মূলতঃ গ্রাম সমাজে এর কাঠামো এবং ভূমিকা পর্যালোচনা দেখা যায়। নগর সমাজ ব্যবস্থায় দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া জ্ঞাতি সম্পর্কের অধ্যয়ন একেবারেই অনুপস্থিত। জ্ঞাতিসম্পর্কের কাঠামো জ্ঞাতিত্বের অর্থ এবং জ্ঞাতি আচরণ অনুধাবনের জন্য আমি একভাবে বাধ্য হয়ে গ্রাম সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা করি, যাতে করে সাধারণভাবে সম্পর্কের কাঠামোর প্রধানভিত্তিগুলো ও এতদসংক্রান্ত প্রত্যয় অনুধাবন এবং নগর জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নে এদের প্রয়োগ সম্ভব কিনা তা দেখার সুযোগ থাকে। তদুপরি বাংলাদেশের একটি ছোট শহর যেখানে গ্রাম থেকে বড় নগরে রূপান্তরনের প্রক্রিয়া মাত্র শুরু হয়েছে এবং যেখানে দৃশ্যতই নাগরিক কর্মকান্ড তথা মজুরী শ্রমের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনের সাথে বহু পরিবার জড়িত সেখানকার জ্ঞাতি সম্পর্ক বিন্যাস বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানে গ্রামীণ সমাজ অধ্যায়নে ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহ বা বিশ্লেষণ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়ন মূলতঃ পুরুষের দিক থেকেই দেখা হয়েছে, যেখানে প্রজন্ম নির্মাণে ও বিয়ের মাধ্যমে মিত্রতা স্থাপনের ক্ষেত্রে পুরুষ যে ভূমিকা পালন করে তাকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক কালে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় নারীকে জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বংশ বা গোষ্ঠী জ্ঞাতি সম্পর্ককে নির্ধারন করে

নৃবৈজ্ঞানিক কাজে জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে যারা মনোযোগ দেন তারা সকলেই বাংলাদেশের জন্য একে কেন্দ্রীয় সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে দেখেন যা কিনা একজন সাধারণ 'পূর্ব পুরুষের' সঙ্গে জৈবিক বন্ধন, সম প্রজন্মে বিবাহ বন্ধন এবং কাল্পনিক বা পাতানো আত্মীয় গ্রহণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় (আজিজ, ১৯৮৫; বার্টুসি, ১৯৯২; জাহাঙ্গীর, ১৯৯৭; আরেফিন, ১৯৯৪; আরেন্স ও ব্যুরদেন, ১৯৮০; ইসলাম, ১৯৯৮; হোয়াইট, ১৯৯২)।

বাঙালী মুসলিম কৃষক সমাজে প্রায় সকলেই বংশকে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতিসম্পর্ক হিসাবে চিহ্নিত করেন। বংশের ভিত্তি হলো রক্ত সম্পর্ক, তাদের মতে যেহেতু গ্রামীণ সমাজ পুরুষ শাসিত, পরিবারে স্বামী বা পিতাই কর্তা স্থানীয়, (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৭) অতএব বংশ নির্ধারণের জন্য মূলতঃ পুরুষ ধারায় রক্ত সম্পর্ককে গুরুত্ব

দেওয়া হয়ে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক বংশ ধারা হলেও সন্তানদের **মাতৃকূলের**[৫] সদস্যদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হতে পারে। জাহাঙ্গীর এই জ্ঞাতিদেরকে দুইভাবে দেখতে পান, **পিতৃকূলের**[৬] জ্ঞাতিকেই তিনি প্রধানতঃ বংশ বা গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু মাতৃকূল ও অন্যান্য আত্মীয়দের এবং পিতৃকূলের দূরের আত্মীয়দের বংশের লোক হিসাবে না দেখিয়ে শুধুমাত্র আত্মীয় হিসাবে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ রক্ত সম্পর্ককে তিনি পিতৃ ধারাতেই দেখতে পেয়েছেন।

একইভাবে আরেফিন (১৯৯৪) শিমুলিয়া গ্রামে বংশ ও গোষ্ঠীকে পিতৃ গোষ্ঠীর সমরূপ হিসাবে দেখেন। যেখানে একদল লোক পিতৃসূত্রীয় বংশাবলীর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আরেন্স ও ব্যুরদেন (১৯৮০) ঝগড়াপুরে বংশ ও গোষ্ঠীকে দুটি ভিন্ন সামাজিক দল হিসাবে দেখতে পান। বংশ বলতে এরাও পূর্ব পুরুষের উত্তরাধিকারীদেরকে বুঝিয়েছেন। যা বিশেষ সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থণৈতিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে গঠিত হয়ে থাকে।

কমপক্ষে দুই বা ততোধিক পরিবারের সমন্বয়েই বংশ বা নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা দলটিকে চিহ্নিত করা যায়। তাদের মতে যখন কোন বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে একটি মাত্র পরিবারে অবশিষ্ট থাকে তখন তাকে আর বংশ বলা যায় না, সেটি পরিবারের রূপ নেয়।

বংশ ও গোষ্ঠীর অর্থ প্রসঙ্গে আরেন্স ও ব্যুরদেন ভিন্নতা নির্দেশ করেন। ঝগড়াপুর গ্রামে গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন অপরিহার্য রূপে দেখা যায় না বরং প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা, পেশাগত যোগাযোগ ও বিয়ের ভিত্তিতে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে আয়তনে এবং প্রজন্মের প্রেক্ষাপটে যদি আত্মীয়তা বিভক্ত হয়ে পড়ে তবে তার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা একেকটি গোষ্ঠী গঠন করতে পারে। মানুষ জন্মগতভাবে বংশের সদস্য পদ লাভ করে। তাই বংশের সদস্য হওয়া না হওয়া কারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া না হওয়া ব্যক্তির ইচ্ছার উপর, বিশেষতঃ, সহযোগিতামূলক মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। আমার উল্লেখিত গবেষণায় একজন উত্তরদাতা বলেন "আমাদের বাড়ীর কোন বিয়ে শাদি হলে সেখানে আমাদের দরিদ্র আত্মীয় স্বজনরাও আসে, ওরা উপহার না দিতে পারলেও বিয়ের অনুষ্ঠানকে শেষ করার জন্য প্রচন্ড পরিশ্রম করে অনুষ্ঠানটাকে ভালোভাবে নামাতে সাহায্য করেন। উপাহারই সব না। আনন্দ উৎসবে সাথ দেওয়াই তো আত্মীয়তা"।

আপন আত্মীয় বা বংশের আত্মীয় দূরের হয়ে যেতে পারে। একইভাবে অনাত্মীয় সার্বিক সহযোগিতা এবং দায়-দায়িত্বের বোধ নিয়ে নিকট আত্মীয়ের ভূমিকা পালন করতে পারে। শ্রেণী বৈষম্য আত্মীয়তার নৈকট্য ও দূরত্ব সৃষ্টিতে একটি প্রধান কারণ হয়ে যায় তেমনি লিঙ্গীয় বৈষম্যের চর্চা বাংলাদেশের সমাজে সাধারণতঃ নারীকে তার পিতৃ বংশ থেকে বিয়ের পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। বাঙালী নারীরা তাদের বাবার বাড়ীর সম্পত্তি ভাইদের কাছে গচ্ছিত রাখেন যাতে কখনও তালাকপ্রাপ্ত হলে বা স্বামী মারা গেলে ঐ সম্পদ তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়। পিতৃসূত্রীয় বংশ ধারায় নারীকে এভাবেই জ্ঞাতি অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় অথবা মতাদর্শিক নির্ভরশীলতার মধ্যে ধরে রাখা হয় (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৭; কবীর ১৯৯৫)। নারীকে সম্পত্তি দান ও তা প্রাপ্তির ব্যাপারে সরলীকরণ করা সমস্যাজনক কেননা বাস্তবে 'আপন' ভাই, বোনকে বঞ্চিত করতে পারেন বা হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেন।

ব্যক্তির সামাজিক জীবন পুনরুৎপাদনে জ্ঞাতি সম্পর্কের মধ্য থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক সহযোগিতা পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে অসমভাবে বন্টিত হয়ে থাকে এ কারণে নারীবাদী লেখকরা জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেন (Harris, 1981)। কেননা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে পরিবার বা গৃহস্থলী মিথস্ক্রিয়া করে গৃহস্থলীর সদস্যরা প্রতিদিন বাঁচার জন্য যে কাজগুলো শেয়ার করার মধ্য দিয়ে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া ধরে রাখে সেখানে বিয়ে নারীকে অবদমন এমন কি নির্যাতনের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই জ্ঞাতি সম্পর্কের মধ্যে নারী-পুরুষের ঘনিষ্ট সম্পর্ক যথা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে দেখা প্রয়োজন।

ঢাকা মহানগরীর একটি দরিদ্র শ্রমজীবী সম্প্রদায়ে নৃবৈজ্ঞানিক কাজের মাধ্যমে ইসলাম[৭] (১৯৯৮) দেখান প্রকৃত বংশ এবং বিয়ের সম্পর্কের মধ্যে থেকে ক্ষেত্র বিশেষে নারীরা সহযোগিতা পেলেও প্রায়শই বঞ্চনা, অস্বীকৃতি এবং অসহযোগিতার শিকার হয়। মতাদর্শিকভাবে বংশ এবং স্থায়ী আত্মীয় বলতে পিতৃ বংশ ও পুরুষের নৈকট্যকে যেভাবে বোঝা হতো সেটি এ গবেষণা কাজের (ইসলাম ১৯৯৮) মাধ্যমে প্রশ্ন বিদ্ধ হয়েছে। এই গবেষণা বরং দেখায় কিভাবে একটি অধস্তন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারী শ্রমিকেরা মাতৃসূত্রে আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্ক নির্মাণ করছে (যথা মা-মেয়ে–নাতনীর সংসার) অথবা দূরের আত্মীয় এমনকি, অনাত্মীয় প্রতিবেশী ও শ্রম সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকজনকে জ্ঞাতিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত করে থাকে।

উপসংহার

জ্ঞাতি সম্পর্ক কোন প্রদেয় বা প্রাকৃতিক বিষয় নয়। এটি আত্মীয়তার মধ্যে কোন স্থবির ধারণা তৈরি করে না বরং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সাথে লেনদেনের প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়তই জ্ঞাতিসম্পর্কের অর্থ তৈরী হয় ও পরিবর্তীত হয়। জীবন চক্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার শ্রেণী ও লিঙ্গীয় অবস্থানের কারনে জ্ঞাতি সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে যথা সহযোগিতার, দ্বন্দের, পৃষ্ঠপোষণ ও নিয়ন্ত্রণ এজেন্ট হিসাবে উপলব্ধি করে থাকে। যে কোন অর্থেই এই সম্পর্ক বিরাজমান থাকুক না কেন ব্যক্তির সামাজিক জীবন পুরুৎপাদনে জ্ঞাতিসম্পর্ক জোড়ালো ভূমিকা রাখছে। জ্ঞাতি সম্পর্ককে একটি সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে বিবেচনা করতে হবে যেখানে সম্পর্কের মধ্যে রাজনৈতিকতার অর্থাৎ দ্বন্দ, বৈষম্য বা অসহযোগিতা, স্বার্থ চিন্তাও ক্রিয়াশীল এবং জ্ঞাতিত্ব বিষয়টিই একাধারে মতাদর্শিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়।

টীকা

১. এই নিবন্ধটি মূলত আমার এম এস এস শিক্ষাক্রমের অংশ হিসাবে যে গবেষণা করেছিলাম তার উপর ভিত্তি করে লেখা। আমার সেই সময়ের গবেষণার শিরোনাম ছিল 'সামাজিক পুরুৎপাদনে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা: একটি শহরের (বেড়া, পাবনা) প্রেক্ষিতে অধ্যয়ন।'এই গবেষণার জন্য আমি বেড়া পৌরসভার একটি পরিবারকে বেছে নিয়েছিলাম। বেড়া ক্রমেই পরিবর্তীত হওয়া একটি শহর যেখানে সাধারন মানুষ কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ভিতর থেকেই নিজেদের পেশার পরিবর্তন করে বহুবিধ কর্মকান্ডে জড়াচ্ছিলেন। এছাড়া এখানে বড় শহরের মত অনেক সুবিধা না থাকলেও নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন অফিস আদালত রয়েছে। এই সমাজ পরিবর্তনশীল একটি সমাজ।

২. ষ্ট্যাক (১৯৭০) আমেরিকায় ও ইসলাম (১৯৯৮) ঢাকায় গবেষণা করে পাতানো সম্পর্কের আত্মীয়তাকে গুরুত্বপূর্ন অবস্থানে দেখতে পান।

৩. আমি যে কেন্দ্রীয় পরিবারকে পর্যবেক্ষণে নিয়েছিলাম সেই পরিবারের নারীর বাবার বাড়ী গ্রামে, যেখান থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে।

৪. হালদার (২০০১) দেখান যে মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন আত্মীয়দের কাছে আশ্রয় খোজে।

৫. মাতৃকূল বলতে মায়ের বাবার বংশের আত্মীয়-স্বজনকে বুঝানো হয়।

৬. পিতৃকূল বলতে বাবার বংশের আত্মীয়-স্বজনকে বুঝানো হয়।

৭. বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ফারজানা ইসলাম ঢাকা মহানগরে ইনফরমাল সেক্টরে গবেষণা করেছেন। তাই তার সাথে উক্ত গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে আলাপ করে জানতে পারি কিভাবে বস্তুগত সম্পর্ক প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাবে জ্ঞাতিসম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠছে আবার কিভাবে নিজেদের টিকে থাকার জন্য কৌশল হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

তথ্য সূত্র

১. আহমেদ হাসিনা, ১৯৯৫; আত্মীয় সম্পর্কের উপর নদী ভাঙ্গনের প্রভাব: একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ। সমাজ নিরীক্ষণ-৫৮, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা। পৃ: ৫৯-৮৩।

২. আহমেদ শাহীন, ১৯৯২; রাইটস অব প্যাসেজ ও বাংলাদেশের নারী, বাংলাদেশ নৃবিজ্ঞান। আরেফিন হেলাল উদ্দিন খান সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা। পৃ: ৬৫-৮২।

৩. বার্টুসি পিটার জে., ১৯৯২; 'অস্পষ্ট গ্রাম'; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট আগারগাও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। পৃ: ৬৩-৯১।

৪. জাহাঙ্গীর বোরহান উদ্দিন খান, ১৯৯৭; বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণী সংগ্রাম, ডালেমচন্দ্র বর্মন ও সুরাইয়া বেগম অনুদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা। পৃ: ৬৪-৮০।

৫. হালদার রুমেল, ২০০১; শ্রেনীভেদে অভিবাসন: প্রেক্ষিত নদীভাঙ্গন, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা সংখ্যা ৬, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. আরেন্স ইয়েনেকা ও ব্যুরদেন ইত্তসফান, ১৯৮০; ঝগড়াপুর, গণ প্রকাশনী, ঢাকা। পৃ: ১১৬-১৩৬।

৭. আরেফিন হেলালউদ্দিন খান, ১৯৯৪; শিমুলিয়া, বাংলাদেশের পরিবতনশীল কৃষিকাঠামো, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা। পৃ: ৪৪-৭৩।

৮. Aziz K. M. Ashraful & Malony Clarence, 1985; Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Routledge, London & New York. Pp: 151-154, 310-336.

৯. Fox Robin, 1967; Kinship and Marriage Cambridge University press

১০. Harris Olivia, 1981; Households as Natural Units. In, of Marriage and the Market. Young Kate (et.al) CSE Books. Pp 49-68.

১১. Holy Ladislav, 1996; Anthropological perspectives on kinship. Pluto press. London, Chicago. P.12.

১২. Islam F. and Zeitlyn S., 1987; Ethnographic profile of Dhaka Slums, Oriental Geographer, Vol. 31. Dhaka.

১৩. Islam Farzana, 1998; Women, Employment and Family: Poor Informal Sector Women Workers in Dhaka City. Unpublished D. Phill Thesis submitted at the University of Sussex, UK.

১৪. Kabeer Naila, 1995; Reversed Realities, UPL.

১৫. Keesing Roger M., 1975; Kin Groups and Social Structure. Holt, Rinehart and Winston, Inc.

১৬. Levi-strauss Claude, 1973; Structural Anthropology. Volume-2. Penguin Books.

১৭. Meillassoux Claude, 1975; Maidens, Meal and money, Cambridge University Press.

১৮. Moore Henrietta L., 1988; Kinship, Labour and Household: Under standing women's work. In **Feminism and Anthropology**. Polity Press U.K. Pp. 42-72.

১৯. Rapp Rayna, 1987; Toward a Nuclear Freeze? The Gender Politics of Euro- merican Kinship Analysis in **Gender and Kinship**. Colier J. F. & Yanagisako S.J. (ed.). Standford University Press. California. Pp: 119-131.

২০. Stack Carol B., 1970; Black Urban Poor. In **All our kin Stragetic for Survival in a Black Community.** Harper and Row. Pp 22-31, 104-105.

২১. Standing Hilary, 1991; Dependence and autonomy. Women's employment and thefamily in Calcutta, Routledge, London and New York.

২২. White Sarch. C., 1992; Arguing with the Crocodile. Gender and class in Bangladesh. UPL. Pp: 88-93, 107-115.

২৩. Wolf Margery, 2000; Uterine families and the Women's community in **Conformity and conflict**, Spradley. J. (Et. al). A Pearson Education Company. Needham Heights: P. 221.

২৪. Yanagisako, Sylvia Junko and Collier Jane Fishburne (ed), 1987; Gender and Kinship. Essays Towards A Unified Analysis. Stanford University Press, California. Pp 3-13.